কোয়ান্টাম বুলেটিন

ডিসেম্বর ২০২০

মমতার পরশে শেষ বিদায়

বিশেষ নিয়তে দাফনসেবায় দান করুন

মৃতের অন্তিম যাত্রায় মমতার পরশ বুলিয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে কোয়ান্টাম দাফনসেবা কার্যক্রম। মহামারি ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে শুধু নয়, এ সেবা দেশজুড়ে দেয়া হচ্ছে নিয়মিত ভিত্তিতে। ধর্ম ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সার্বজনীন এ সেবা যে-কেউ গ্রহণ করতে পারেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এটি পরিচালিত হচ্ছে কোয়ান্টামের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শ্রমে ও দানে।

ইসলামের বিধান অনুসারে একজন মুসলমানকে যথাযথভাবে শেষ বিদায় জানানো 'ফরজে কিফায়া'। অর্থাৎ সবার পক্ষ থেকে কাউকে না কাউকে এ কাজটি করতে হবে। কিন্তু কেউই যদি তা না করে, তাহলে সমাজের সবাই গুনাহগার হবে।

আর এ-ও সত্য যে, মৃত ব্যক্তির চেয়ে নিঃস্ব কেউ নেই। করোনাকালে এ নির্মম সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমাদের সামনে।

মূলত এসব উপলব্ধি থেকেই আপনজনের মমতায় মৃতের দাফন-সৎকার-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম। মৃতের গোসল/পরিচ্ছন্নতার জন্যে ঢাকার বনশ্রী ও কাকরাইলে স্থাপন করা হয়েছে দুটি হাম্মাম। মিরপুর উত্তরা মোহাম্মদপুরসহ পর্যায়ক্রমে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে হাম্মাম স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পরিচিত পরিমণ্ডলে বার্তা পৌঁছে দিন—মৃতদেহের গোসল, কাফনের কাপড় পরানো ও দাফনের কাজগুলো সুসম্পন্ন করার জন্যে কোয়ান্টামকে তারা পাশে পাবেন সবসময়।

উল্লেখ্য, অক্ষম ও অভাবগ্রস্তের মৃতদেহ দাফন/ সৎকারের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে কোয়ান্টামের উদ্যোগে রাজশাহীতে শুরু হয় দাফনসেবা। পরবর্তীকালে এ সেবা বিস্তৃত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

পুণ্যময় এ-কাজে আপনিও শরিক হোন। নতুন বছর ২০২১-এ আপনার পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, প্রশান্তি ও সাফল্য কামনায় কিংবা যে-কোনো বিশেষ নিয়তে দান করুন দাফন ফান্ডে। পরিচিতদেরও উদ্বুদ্ধ করুন। আপনার দানে মৃতের শেষ বিদায় হোক মমতার পরশে পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায়।

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

নিয়মিত বঙ্গাসন চর্চা করুন সুস্থ ও কর্মোদ্দীপ্ত থাকুন

আমাদের দেশে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটছে। সেইসাথে বাড়ছে জীবনযাপনে নানা অনাচার বিলাসিতা নিষ্ক্রিয়তা। গত ১০ বছরে রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছেয়ে গেছে স্বাস্থ্যঘাতী খাদ্যপণ্যে। ফলে বাড়ছে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, আর্থ্রাইটিস, হাড়ক্ষয়, বিষণ্নতাসহ নানা রোগ।

আগে স্বল্প দূরত্বে মানুষ হেঁটে যেত, এখন চলাফেরা করে রিকশা, সিএনজি বা গাড়িতে। তিন-চার তলায় যেতেও সিঁড়ির বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে লিফট। অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, ধূমপান ও এইডসে বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর যত মানুষ মারা যায়, তার চেয়ে বেশি মারা যায় দীর্ঘসময় চেয়ার বা সোফায় বসে থাকা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তার কারণে সৃষ্ট রোগব্যাধিতে।

এর সমাধান খুব সহজ—নিয়মিত বঙ্গাসন চর্চা। সৃষ্টির শুরুতে মানুষ যখন বসতে শিখেছে, তখন সে এই আসনেই বসেছে। এটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে আদি আসন। আমরা এর নাম দিয়েছি বঙ্গাসন।

দুই পায়ের পাতায় ভর করে বসা—এটিই বঙ্গাসন। দুপায়ের মাঝে এক হাত বা আরামদায়ক পরিমাণ ফাঁকা থাকবে। পায়ের পেশি উরু স্পর্শ করবে। দুহাত থাকবে দুই হাঁটুর দুপাশে কিংবা হাঁটুর ওপরে। নিতম্ব মাটি স্পর্শ করবে না। (*ছবি : পৃষ্ঠা ৩*)

গ্রামবাংলার মানুষ ৫০ বছর আগেও যখন ঘরে বসত বা দাওয়াতে যেত, এভাবেই মাটিতে বসত।

আদিকাল থেকে মানুষ এই আসনটিই ব্যবহার করত মলত্যাগের ক্ষেত্রেও। ৫০ বছরের গবেষণায় চিকিৎসাবিদরা দেখেছেন—মলত্যাগের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যসম্মত ভঙ্গি হলো এটি। আর হাই কমোডে বসলে মলদ্বার বঙ্গাসনের তুলনায় ২৬ ডিগ্রি কম প্রশস্ত হয়। যে কারণে দীর্ঘদিন ধরে কমোডে যারা অভ্যস্ত, তাদের পাইলস ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

যে নারীরা নরমাল ডেলিভারি চান, গর্ভধারণের শুরু থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে বঙ্গাসন চর্চা করুন। দৈনন্দিন কাজগুলো বঙ্গাসনে বসে করার অভ্যাস করুন। ফিটনেসের পাশাপাশি বাড়বে স্বাভাবিকভাবে সুস্থ সন্তান প্রসব করার সম্ভাবনা।

> **বঙ্গাসনে পায়ের পেশি পাঁচগুণ বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। সার্বিক ফিটনেস বাড়ার সাথে সাথে দেহের হাড় ও পেশি কর্মক্ষম থাকে দীর্ঘদিন।**

বঙ্গাসনে পায়ের পেশি পাঁচগুণ বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে থাকলে যে পরিমাণ ক্যালরি খরচ হয়, বঙ্গাসনে একই পরিমাণ ক্যালরি খরচ হয়। পায়ের পেশি মজবুত হয়। উরু ও পেটের পেশিতে চাপ পড়ে। বাড়তি মেদ ঝরে যায়। সার্বিক ফিটনেস বাড়ার সাথে সাথে দেহের হাড় ও পেশি কর্মক্ষম থাকে দীর্ঘদিন।

তাই নিয়মিত বঙ্গাসন চর্চা করুন। এর পাশাপাশি শরীরটাকে সবসময় গতির মধ্যে রাখুন। যখনই সম্ভব হয় হাঁটুন, কোয়ান্টাম ইয়োগা করুন। মানসিক স্থিরতার জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন। নিজেকে ভালো কাজে ব্যস্ত রাখুন। সুস্থ থাকুন সারাবছর।

নতুন বছরে নতুন আঙ্গিকে কোয়ান্টাম বুলেটিন

ফাউন্ডেশনের মুখপত্র *কোয়ান্টাম বুলেটিন*। ইতিবাচকতার বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিতেই ১৯৯৭ সালে যাত্রা শুরু করে এই প্রকাশনা, যা ২০০১ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এরও আগে ১৯৯৩-৯৪ সালে কোয়ান্টাম মেথডের প্রথম ১২টি ব্যাচ পর্যন্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক আহমেদ নূরে আলমের সম্পাদনায় *আত্মনির্মাণ* নামে এটি প্রকাশিত হতো।

সর্বস্তরের পাঠকের জন্যে বুলেটিনে রয়েছে মেডিটেশন ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, কোয়ান্টাম সাফল্যসূত্র অনুসরণ করে শূন্য থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো ব্যক্তিদের উপলব্ধি, কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে আমন্ত্রিত বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের বক্তব্য ও সাক্ষাৎকার, নানা প্রসঙ্গে গুরুজীর কাছে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের করা প্রশ্নের উত্তর এবং সভ্যতার বিকাশে নিবেদিত মনীষীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

কোয়ান্টাম সদস্যদের আন্তরিক তৎপরতায় বুলেটিন পৌঁছে যাচ্ছে দেশের হাজার হাজার পরিবারে। এর একেকটি লেখা নতুনভাবে উজ্জীবিত করে পাঠককে। দ্বিধা-শঙ্কা কাটিয়ে তিনি খুঁজে পান বিশ্বাস ও কর্মোদ্দীপনা।

এই প্রয়াসকে আরো একধাপ এগিয়ে নিতে নতুন বছরে নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত হচ্ছে কোয়ান্টাম বুলেটিন। পাঠকের জন্যেও থাকবে লেখা পাঠানোর সুযোগ। 'পাঠকের পাতা'য় ছাপানো হবে আগ্রহীদের লেখা। লেখা জমা দিন এই ঠিকানায় bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৪৭০ ব্যাচ

১১, ১২, ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

যে-কেউ অংশ নিতে পারেন।

যোগাযোগ : ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

৯ ডিসেম্বর ২০১৯ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৯৫ তম পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন শহিদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারের সহধর্মিণী অধ্যাপিকা পান্না কায়সার। তার আলোচনার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

বড় কিছু পেতে হলে বড় কিছু ত্যাগও করতে হয়

শহিদজায়া পান্না কায়সার

১৯৭১ সাল, ৩ ডিসেম্বরের পর থেকেই আমাদের বাড়িটা হয়ে উঠেছিল একটা মিলনকেন্দ্র। বাড়িতে বহু মানুষের নিত্য আনাগোনা। দেশ স্বাধীন হচ্ছে—এমন একটা কথা তখন সবার মুখে মুখে। সে-সময় শহীদুল্লা কায়সার প্রতিদিন লিখতে বসতেন। স্বাধীন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের প্রথম হেডলাইনটা কী হবে, এই নিয়ে তার যত চিন্তা। লিখছেন, পছন্দ হচ্ছে না, আবার লিখছেন—এভাবেই চলছিল।

২৫ মার্চ রাতে *সংবাদ* ও *ইত্তেফাক* অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল হানাদার বাহিনী। কিন্তু শহীদুল্লা কায়সার বিশ্বাস করতেন—স্বাধীনতার পর আবার সব নতুন করে গড়ে উঠবে। এতদিনের জমানো স্বপ্ন! আত্মমর্যাদায় বাঙালির বিকশিত হওয়ার স্বপ্নকে ঠিক কোন শব্দে-বাক্যে সাজাবেন, এ নিয়েই তখন তিনি সারাক্ষণ ভাবছেন আর লিখছেন। তার সমস্ত চিন্তাচেতনা জুড়ে ছিল দেশ, দেশের মানুষ, স্বাধীনতা।

১৪ ডিসেম্বর। কারফিউ চলছে, সবখানে আতঙ্ক আর চাপা উত্তেজনা। আমাদের বাড়ির দরজায় কিছু লোক ধাক্কাধাক্কি করছে। বেশ শোরগোল। আমার দেবর ছুটে এসে এটা বলতেই শহীদুল্লা কায়সার বললেন—'দেশ তো স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে! আর কোনো ভয় নেই। এখন কত জায়গা থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আসবে! তাদের হাতে কোনো টাকাপয়সা নেই, খাবার নেই, আশ্রয় নেই। সব দরজা খুলে দাও।' সে কী উচ্ছ্বাস তার মধ্যে! আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুললেন। টাকাপয়সা নিয়ে পকেটে রাখলেন, মুক্তিযোদ্ধারা এলে তাদের যেন দিতে পারেন। কিন্তু কারো দেখা নেই। কোনো সাড়াশব্দও নেই।

বেশ অনেকক্ষণ পর চার জন লোক এলো। তাদের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। ঘরে ঢুকেই লোকগুলো প্রশ্ন করল—'শহীদুল্লা কায়সার কে?'

'আমিই শহীদুল্লা কায়সার!' আমার স্বামী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। ওরা কোনো কথা না বলে হ্যাঁচকা টানে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। অজানা আতঙ্কে আমি তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য—ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে শহীদুল্লা কায়সারকে?

বাইরে এসে দেখি, বিশাল এক জিপ গাড়ি। যখন শহীদুল্লা কায়সারকে গাড়িতে তুলবে, তার হাত চেপে ধরলাম আমি আর আমার ননদ। কিন্তু এতগুলো শক্তসমর্থ পুরুষের সাথে আমরা কীভাবে পারব!

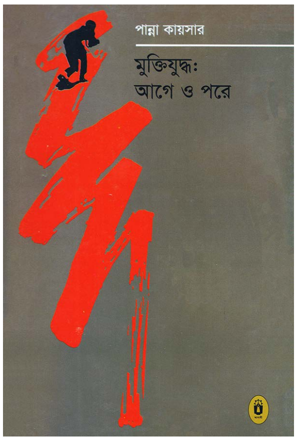

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আত্মজৈবনিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে পান্না কায়সার রচিত অসামান্য গ্রন্থ 'মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে'

একসময় চিরচেনা হাতটা আমার মুঠো গলে বেরিয়ে গেল। আমার স্বামী পেছন ফিরে হাসিমুখে বললেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না। আমি ফিরে আসব। তুমি ভালো থেকো। বাচ্চাদের দেখে রেখো।' তার সাথে সেই আমার শেষ কথা।

এমনই এক কারফিউ-র দিনে আমার বিয়ে হয়েছিল। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। ২০ তারিখ কারফিউ উঠে গেল। রাতে শহীদুল্লা আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ভাষা শহিদদের স্মরণে সেখানে আলপনা করছিল। তাদের দেশপ্রেম, আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেন রং-তুলির মধ্য দিয়ে কথা বলছে। এমন দৃশ্য আমি আগে কখনো দেখি নি!

৭ই মার্চ ১৯৭১—বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনতেও তিনি আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। আমার গর্ভে তখন আমাদের দ্বিতীয় সন্তান। এই শরীর নিয়ে ওখানে যাব কিনা দ্বিধায় ছিলাম। কিন্তু তার কথা—'তোমার জীবদ্দশায় এমন ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আর হবে না। চলো, আমার সন্তান জন্মের আগেই স্বাধীনতার ঘোষণা শুনবে! তোমার জীবনে এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের ঘৃণ্যতম হত্যাযজ্ঞ। সারারাত আমরা শহীদ মিনার ভাঙার শব্দ ও মানুষের আহাজারি শুনেছি। ২৭ মার্চ কিছু সময়ের জন্যে কারফিউ স্থগিত হলে শহীদুল্লা কায়সার বললেন, 'একটু দেখে আসি কে কোথায় আছে।' আমিও গেলাম তার সঙ্গে। গাড়ি গিয়ে থামল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সামনে। ছাত্র-শিক্ষকদের শত শত লাশ পড়ে আছে ওখানে। আমাকে গাড়িতে রেখে তিনি লাশ সৎকারে অংশ নিলেন। যখন ফিরলেন, দেখি তার শার্টে ছোপ ছোপ রক্ত!

সেদিন বাসায় ফিরে শার্টটা আমি ধুয়ে দিলাম। আমার শাশুড়ি আমাকে খুব বকলেন—'তুমি শহিদের রক্ত কেন ধুয়ে ফেলেছ? এ শার্টটা তুমি যত্ন করে রেখে দিতে পারতে! এর স্থান হতো জাদুঘরে।'

মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস প্রতিনিয়ত আমাদের বাড়িতে ছদ্মবেশে আসতেন মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের জন্যে বস্তাভর্তি শুকনো খাবার ও ওষুধ মজুদ রাখা হতো। আর এ জিনিসগুলো নিয়মিত সরবরাহ করতেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. ফজলে রাব্বি। এভাবেই কেউ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে, কেউ কলম হাতে যুদ্ধ করেছে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা তো শব্দ নিয়ে যুদ্ধ করেছে। তখন 'আমি' বলে কিছু ছিল না, সবাই মিলে 'আমরা' হতে পেরেছিলাম।

১৬ ডিসেম্বর যখন সর্বত্রই বিজয়ের আনন্দ, আমার মনে তখন শত প্রশ্ন। শহীদুল্লা কায়সার কবে ফিরবেন? আদৌ ফিরবেন তো? সেদিনই আমার ছোট দেবর বললেন, চলুন, বড়দাকে খুঁজে আনি। রিকশায় করে রওনা হলাম দুজন। রিকশা এসে থামল রায়ের বাজার। কিন্তু এ কোথায় এলাম আমি! চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। কাদামাটির মধ্যে পড়ে আছে নারী-পুরুষ-শিশুর মৃতদেহ। কিন্তু আমি তো একটা জীবন্ত মানুষ খুঁজতে এসেছি!

জানি না সেদিন কোত্থেকে শক্তি পেয়েছিলাম, লাশগুলো উল্টে উল্টে দেখতে লাগলাম। লাশের কাফেলায় অক্লান্ত খুঁজে যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় তিনি? খুঁজতে খুঁজতে একসময় উপলব্ধি করলাম—এটাই মুক্তিযুদ্ধ, এটাই স্বাধীনতার যুদ্ধ! নতুন এক সত্যকে আমি জানলাম—বড় কিছু পেতে হলে বড় কিছু ত্যাগও করতে হয়। অগণিত মানুষের এমন ত্যাগের মধ্য দিয়েই এসেছে স্বাধীনতা।

হয়তো এখনো অনেক স্বপ্নকে আমরা ছুঁতে পারি নি, জাতি হিসেবে প্রত্যাশিত জায়গায় পৌঁছতে পারি নি। কিন্তু সেটা সম্ভব, যদি আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি। ১৯৭১ সালের সেই কঠিন সময়ে আমরা যে যেভাবে পেরেছি সহযোগিতা করেছি, দেশের জন্যে কাজ করেছি। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বহিঃশত্রুকে আমরা তো ঠিকই উৎখাত করতে পেরেছি। তাহলে এখন কেন সম্ভব নয়? এখন তো মানুষ আমাদের, সমাজ আমাদের, দেশ আমাদের। তাহলে আর দ্বিধা কীসের? ভয়টা কোথায়?

এখন আমাদের একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমাদের দেশটা গড়তে হবে আমাদেরকেই। আগামী প্রজন্মের হাত ধরে বলতে হবে, সব জঞ্জাল সরিয়ে সামনে এগিয়ে চলো। কোয়ান্টামের সুরে সুর মিলিয়ে আমি বলতে চাই—আসুন, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা করে আমরা সোনার বাংলা গড়ে তুলি। দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করি।

অনুলিখিত

দীর্ঘজীবনের রহস্য ॥ বসার সঠিক ভঙ্গি

কর্মব্যস্ততার মতো বিশ্রামও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে আপনার সেই বিশ্রাম যদি হয় চেয়ার বা সোফায় গা এলিয়ে বসে থাকা, তাহলে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, চেয়ার-সোফায় দীর্ঘসময় বসে থাকার অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে গুরুতর দৈহিক সমস্যা। অন্যদিকে বসার সঠিক ভঙ্গি দেবে প্রাণবন্ত সুস্থতা—এমনকি দীর্ঘায়ু।

চেয়ার কেড়ে নিচ্ছে আপনার আয়ু

একটু পেছনে ফিরে যাওয়া যাক। ২০১২ সাল। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও মহামারি-গবেষক ডা. আই-মিন লি ও তার সহকর্মীরা মিলে গবেষণা করলেন হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুহার, মৃত্যুর কারণ এবং এ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে। বিশ্বখ্যাত স্বাস্থ্য-সাময়িকী *দ্য ল্যানসেট*-এ প্রকাশিত হলো এ গবেষণার চমকপ্রদ ফলাফল।

ঘাতক ব্যাধিতে মৃতদের মধ্যে একটি জায়গায় মিল খুঁজে পান প্রফেসর লি। তা হলো দীর্ঘসময় ধরে নিষ্ক্রিয় বসে থাকার অভ্যাস। তার মতে, শুধু শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর মারা যায় ৫০ লক্ষ মানুষ। কারণ কর্মহীন-গতিহীন জীবনযাপন আমাদের দেহ-মনের জন্যে ধূমপান ও মেদস্থূলতার মতোই ক্ষতিকর!

সাম্প্রতিক সময়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকার অভ্যাসকে ধূমপানের সাথেই তুলনা করা হচ্ছে। যারা দিনের বেশিরভাগ সময় ডিজিটাল স্ক্রিনের সামনে বসে কাটিয়ে দেন, তারা ঝুঁকিতে আছেন আরো বেশি। শুধু তা-ই নয়, যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন, তার দৈহিক ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে ব্যায়ামের অভ্যাসও কার্যকরী কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। তাই বলা যায়, উচ্চমূল্যে কেনা দৃষ্টিনন্দন চেয়ার বা সোফাটি আসলে প্রত্যেকের জীবন থেকে আয়ু কেড়ে নিচ্ছে তার অজান্তেই।

স্থবির দিনযাপন ॥ বহু রোগের কারণ

বসে থাকার দৈহিক প্রভাব নিয়ে শুধু সাম্প্রতিক সময়ে নয়, গবেষণা হয়েছে অতীতেও। ১৯৫৩ সালে স্কটিশ মহামারি-তত্ত্ববিদ ডা. জেরি মরিস একটি গবেষণা পরিচালনা করেন লন্ডনের পরিবহন কর্মীদের নিয়ে। তিনি দেখলেন, কাজের প্রয়োজনেই বাসচালকেরা দিনের বেশিরভাগ সময় বসে থাকেন তাদের ড্রাইভিং সিটে। অন্যদিকে বাসের কন্ডাক্টরকে টিকেট চেকিং ও আনুষঙ্গিক কাজে ছুটোছুটি করতে হয় সারাদিন। আর ডাবল ডেকার বাস হলে তো কথাই নেই, যখন-তখন সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা। জেরি মরিস ও তার সহকর্মীরা ৩১ হাজার পরিবহন কর্মীর ওপর দুবছর জরিপ চালান। তারা দেখেন, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার মাত্রা কন্ডাক্টরদের তুলনায় বাসচালকদের ৩০% বেশি। শুধু তা-ই নয়, তাদের অধিকাংশই হৃদরোগে আক্রান্ত হন অল্প বয়সে এবং রোগের ভোগান্তিও হয় বেশি।

পরবর্তীকালে একই ধরনের গবেষণা করা হয় ডাক বিভাগের কর্মীদের নিয়ে এবং ফলাফল ছিল একই। অর্থাৎ চিঠি-সংক্রান্ত কাজগুলো যারা অফিসে বসে করেন, তাদের তুলনায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিঠি বিলি করায় নিয়োজিতদের সুস্থতার পরিমাণ বেশি।

ডা. মরিস মূলত হৃদরোগ প্রতিরোধে কায়িক পরিশ্রমের গুরুত্ব তুলে ধরারই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অনেকেই ১৯৯০-এর শুরুতে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, শুধু বসে থাকার মতো নিরীহ একটি কাজ কীভাবে ভীতিকর সব রোগের জন্ম দিতে পারে! অথচ আধুনিক তথ্য-উপাত্ত বসে থাকাকে মোটেই নিরীহ বলছে না। হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ানোর সাথে সাথে অকালমৃত্যুর সম্ভাবনাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় চেয়ার-সোফার চিরচেনা আরাম।

গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে মহাকাশ গবেষণা যখন তুঙ্গে, সে-সময় NASA নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে—নভোচারীদের দেহে কীভাবে মাধ্যাকর্ষণের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করা যায় তা নিয়ে। পরীক্ষার অংশ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবীদের দীর্ঘসময় ধরে শুয়ে থাকতে হতো। কখনো কখনো দুই মাস সময় ধরেও তা চলত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকার ফলে তাদের হাড়গুলো ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছিল, মাংসপেশি দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয়, নিষ্ক্রিয়তার কারণে তাদের রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড নামক ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল, যার ফলাফল হৃদরোগ।

গতিহীন দেহ কেন রোগের আখড়ায় পরিণত হচ্ছে? কারণ যখন আমরা হাঁটি, দাঁড়িয়ে কাজ করি, তখন পায়ের পেশিগুলো কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন আমরা চেয়ার-সোফা বা বিছানায় বসি, পায়ের পেশিগুলোর কোনো কাজ থাকে না।

দেহ যতটুকু ক্যালরি তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করতে পারে না, দেহের নিজস্ব সিস্টেম সেটাকে চর্বি বানিয়ে রেখে দেয়। এক ধরনের এনজাইম এই চর্বিকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড তৈরি করে। কর্মতৎপর মাংসপেশি সেই ফ্যাটি এসিডকে হজম করে ফেলে। ফলে রক্তে চর্বি জমতে পারে না। কিন্তু চেয়ারে বসা অবস্থায় নিষ্ক্রিয় পেশিগুলো ভাবে, ফ্যাটি এসিড হজমের বাড়তি পরিশ্রমটা করার দরকার কী? ফলে এনজাইম উৎপাদন কমে যায়। রক্তে চর্বি জমতে শুরু করে এবং চেয়ার-নির্ভর শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষ আক্রান্ত হয় হৃদরোগসহ নানা ব্যাধিতে।

সহজ সমাধান ॥ বঙ্গাসন

সমাধান খুঁজতে গিয়ে পাশ্চাত্যের গবেষকদের একটি দল পাড়ি জমালেন আফ্রিকাভুক্ত দেশ তানজানিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে। সেখানে হাদজা জনগোষ্ঠীর বাস। পশু শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করা যে কয়টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এখনো পৃথিবীতে টিকে আছে, হাদজা তাদেরই একটি। তাদের সুস্থতার মাত্রা ঈর্ষণীয়। তারা হৃদরোগ ও অন্যান্য ব্যাধি থেকে পুরোপুরি মুক্ত।

গাড়িবোঝাই যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা হাদজাদের কর্মব্যস্ত একেকটি দিন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন নিবিড়ভাবে। তাদের মতে, শারীরিকভাবে কতটা কর্মময় থাকা সম্ভব, তার আদর্শ উদাহরণ হাদজারা। তবে শুধু ব্যস্ততা নয়, বিশ্রামের কৌশলও তাদের কাছ থেকে শেখা প্রয়োজন আধুনিক মানুষের।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেল, দিন শেষে হাদজা নারী-পুরুষ ঘরে ফিরে বিশ্রামের জন্যে বেছে নেয় নির্দিষ্ট একটি ভঙ্গি। দুই পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে হাত দুটো হাঁটুর ওপর রেখে বসার এই ভঙ্গিকে ইংরেজিতে বলে Squatting বা Squat position. এই ভঙ্গিতে নিতম্ব মাটিতে স্পর্শ করে না এবং দেহের ভর থাকে গোড়ালির ওপর। এভাবে বসেই তারা স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করে দৈনন্দিন কাজ—রান্না, খাওয়া, গল্প-আড্ডা, শীতের রাতে আগুন পোহানো ইত্যাদি।

বঙ্গাসন

নিত্যনতুন পণ্যে ঠাসা এ পৃথিবী, অথচ আজও হাদজাদের ঘরে কোনো চেয়ার নেই। শৈল্পিক নিপুণতায় যে মানুষগুলো তীর-ধনুক থেকে শুরু করে তাপ-বায়ু নিরোধক বাড়ি বানিয়ে ফেলছে সহজেই, তারা আরাম-আয়েশের জন্যে কোনো আসবাবপত্র তৈরি করে না। ঘুমানোর জন্যে তারা ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে নেয় পশুর চামড়া।

গবেষকেরা হিসাব করে দেখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র নেদারল্যান্ডস অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা দিনে প্রায় ১০ ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়। বিস্ময়কর হলো, হাদজারাও দিনে সমপরিমাণ সময় বিশ্রামে কাটায়। তাহলে কীভাবে তারা রোগমুক্ত সুস্থ জীবনযাপন করছে—যেখানে অন্যরা নানা রোগব্যাধিতে ভুগছে প্রতিনিয়ত? এর রহস্য হলো—বসার স্বাস্থ্যকর ভঙ্গি এবং দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস। তাই-তো বিশ্রামের সময়ও হাদজাদের পেশি থাকে সচল, গতিময়। Squatting position (কোয়ান্টাম পরিভাষায় বঙ্গাসন) তাদের দেহের পেশিগুলোকে নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্তি দেয়।

এ আসনে পুরো দেহের ভর থাকে পায়ের ওপর। ফলে পায়ের পেশি মজবুত হয়, দেহে রক্ত চলাচল বাড়ে এবং সংশ্লিষ্ট অংশ ও এর আশেপাশে কোনো চর্বি জমতে পারে না।

তাই বঙ্গাসনের চর্চা করুন। রোগের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নয় বরং সুস্থতার সাথে বন্ধুত্বের সিদ্ধান্ত নিন। চেয়ার-সোফায় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসুন। এই একটি অভ্যাস আপনাকে বহু ক্রোশ এগিয়ে দেবে সুস্থ ও দীর্ঘজীবনের পথে।

তথ্যসূত্র : নিউ সায়েন্টিস্ট, ১৫ জুলাই ২০২০

নিজের ও পরিবারের কল্যাণে

দান করুন, অন্যকে দানে উদ্বুদ্ধ করুন

দুই যুগ ধরে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা তাদের উপার্জনের একটি অংশ দান করছেন কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে। নিজেরা দান করার পাশাপাশি পরিচিতদেরও উদ্বুদ্ধ করছেন; যা কোয়ান্টামের সেবামূলক কার্যক্রমগুলো পরিচালনার অন্যতম চালিকাশক্তি। নিয়মিত সঙ্ঘবদ্ধ দানে তাদের ব্যক্তিগত, পেশাগত ও পারিবারিক জীবনে এসেছে সুস্থতা প্রশান্তি ও কল্যাণ। কয়েকজন দাতার অনুভূতি তুলে ধরা হলো—

মনছবি পূরণের অনুঘটক দান

প্রকৌশলী মো. আকতার হোসেন

২০১২ সালে বিসিএস পরীক্ষার প্রতিটি ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কিছু জটিলতার কারণে সে-বছর আমার চাকরি হয় নি। পারিবারিক কিছু সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। সবসময় আমি মানসিক যন্ত্রণায় থাকতাম।

২০১৫ সালে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি এবং দান, মনছবি ও হিলিং সম্পর্কে জানতে পারি। এরপর নিয়মিত দানের পাশাপাশি মনছবি দেখতে থাকি—আমার চাকরি-সংক্রান্ত জটিলতা দূর হয়ে গেছে এবং আমি সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছি। সদকা হিলিংয়েও নাম দিতাম।

২০১৬ সালে বিসিএস-এর গ্যাজেট ঘোষণা হয়। রি-ভেরিফিকেশনের মাত্র তিন দিন বাকি ছিল। আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। পরিচিত একজন ফোন করে বললেন সশরীরে গিয়ে বিষয়গুলো দেখতে। সাথে সাথেই আমি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিই এবং আমার চাকরি হয়। আমার মনছবি পূরণের অন্যতম অনুঘটক ছিল নিয়মিত মেডিটেশন, দান ও সদকা হিলিং।

[উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, ঢাকা]

বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম

জান্নাত আরা ফেরদাউস উল্কা

প্রতিদিন সকালে দান করে ইতিবাচকতার যে অনুরণন অনুভব করি, তা সারাদিন আমাকে উজ্জীবিত রাখে। সমস্যা ও সংকটে বিশেষ করে পরীক্ষার সময় সাহস পাই। কখনো কখনো রেজাল্ট দেখে নিজেই অবাক হই। দানের রহমত প্রতিকূল মুহূর্তে বেশি অনুভব করি।

আমার বাবা একবছর ধরে বেশ অসুস্থ। কিছুদিন আগে হঠাৎ তার খিঁচুনি শুরু হলো। সাথে সাথে বাবার সুস্থতার নিয়তে আমি কিছু টাকা মাটির ব্যাংকে রাখি। আল্লাহর রহমতে কিছুক্ষণ পরেই তার খিঁচুনি বন্ধ হয়। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। সেদিন বড় ধরনের বিপদ থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন।

[শিক্ষার্থী, চতুর্থ বর্ষ, জেড এইচ শিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ, ঢাকা]

সঙ্ঘবদ্ধ দানে মেলে মানসিক প্রশান্তি

বিজয় লক্ষী বিশ্বাস

এবছর ফেব্রুয়ারিতে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স সম্পন্ন করেছি। এ কোর্সে গুরুজী আমাদের সামনে সঙ্ঘবদ্ধ দানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। দানের অভ্যাস আমার আগেই ছিল। কিন্তু গুরুজীর আলোচনা শুনে আমার মধ্যে অন্যরকম অনুভূতি হয়েছে। মনে হয়েছে, কোয়ান্টামে সঙ্ঘবদ্ধ থাকার কারণে আমরা অনেক বড় কাজ করতে পারছি।

কোর্সের চতুর্থ দিন আমাদের মাটির ব্যাংক দেয়া হয়েছিল। তখন থেকেই আমি নিয়মিত দান করি। মাঝে মাঝেই নিজেকে প্রশ্ন করি—কেন দান করছি? তখন মনে হয়, বড় কিছু পাওয়ার আশায় নয়, আমি দান করি আমার মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তির জন্যে। নিজে জীবনযাপনের বিজ্ঞান অনুসরণের পাশাপাশি অন্যের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারছি, এ বিষয়টি আমাকে তৃপ্তি দেয়।

[অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বরিশাল]

ন্যায্য মূল্যে জমি বিক্রি হলো

বিপ্লব কুমার দাশ

আমরা কয়েকজন মিলে একটি প্লট কিনেছিলাম। পরবর্তী সময়ে আমি জমিটি বিক্রি করতে চাইলে অন্যদের সাথে আমার মনোমালিন্য হয়। তারা নানানভাবে বাধা দেয়ার চেষ্টা করত। জমিটি বিক্রির জন্যে গ্রাহক খুঁজছিলাম কিন্তু কোনোভাবেই কাজ এগোয় নি।

আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করি। একসময় সমস্যা সমাধানের জন্যে আমি মাটির ব্যাংকে এককালীন দান করলাম। সেইসাথে মানত করলাম, যেন আমার জমিটি ভালোভাবে বিক্রি হয় এবং জমির সব কাগজপত্র যেন সহজেই বুঝে পাই। মাটির ব্যাংকে দান করার সাত-আট দিন পরেই স্রষ্টার কৃপায় আমি জমির কাগজপত্র বুঝে পাই এবং ন্যায্য মূল্যে জমিটি বিক্রি হয়ে যায়।

[সহকারী শিক্ষক, ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঝালকাঠি]

ঋণমুক্ত হয়েছি দানের কল্যাণে

মোহাম্মদ এমদাদুল হক শাহজাহান

২৮ বছর ধরে আমি ফার্নিচারের ব্যবসা করছি। এর পাশাপাশি আছে প্লটের ব্যবসা। প্রায় আট বছর আগের কথা। কিছু প্লট বিক্রি করতে পারছিলাম না। সে-সময় আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ি। দিন দিন পরিস্থিতি আরো জটিল হচ্ছিল। ঋণমুক্তির জন্যে মাটির ব্যাংকে দানের মানত করলাম। কিন্তু কাজ হচ্ছিল না।

হঠাৎ মনে পড়ল, একটি প্রোগ্রামে একজন গুরুজীকে প্রশ্ন করেছিলেন—জান-ই সদকা দেয়ার ক্ষেত্রে একটি দেশি মোরগের দাম দিলে হবে কিনা। উত্তরে গুরুজী বলেছিলেন, 'যদি আপনি মনে করেন, আপনার জীবনের মূল্য একটি দেশি মোরগের সমান, তাহলে আপনি দিতে পারেন।'

গুরুজীর যুক্তিটি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। একথা মনে পড়তেই আমি দানের পরিমাণ দ্বিগুণ করলাম। কিছুদিনের মধ্যে কয়েকজন ক্রেতা প্লট দেখে গেলেন ঠিকই, কিন্তু কেনার আগ্রহ দেখালেন না। তখন সাহস করে মানতের পরিমাণ করলাম তিন গুণ। এর পর পরই একজন ক্রেতা কাঙ্ক্ষিত মূল্যে একটি প্লট কিনে নিলেন। তিন মাসের মধ্যে সবগুলো প্লট বিক্রি হলো এবং আমার ঋণও শোধ হয়ে গেল।

[ব্যবসায়ী, সুনামগঞ্জ]

দানের বরকতে সুস্থ আছি

মাহিয়াত মাহফুজ সুপ্রীতি

মা-বাবা কোয়ান্টামের সদস্য হওয়ায় আমরা দুই বোন ছোটবেলা থেকেই দানে অভ্যস্ত। কোনো ভালো কাজে বা পরীক্ষার আগে আমরা মাটির ব্যাংকে দান করি। আমাদের দুজনেরই আলাদা মাটির ব্যাংক আছে।

করোনার সময়ে আমরা পরিবারের সবাই আতঙ্কমুক্ত ছিলাম। চারপাশের অনেকেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু স্রষ্টার রহমত ও দানের বরকতে আমরা সুস্থ আছি, ভালো আছি।

[শিক্ষার্থী, নবম শ্রেণি, বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া]

শুদ্ধাচার ॥ পাঠ ও বিতরণের অনুভূতি

জীবনের ভুলগুলো শনাক্ত করতে পেরেছি

অণুতম বণিক

আমরা অনেক কিছু জেনেও নিজেরা মেনে চলার ব্যাপারে ততটা সচেতন নই। *শুদ্ধাচার* বই বিতরণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আগে আমি প্রায়ই অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে যেতাম। কখনো মুখ ফসকে এমন কোনো কথা বলে ফেলতাম, যা আমার সহধর্মিণী ও সহকর্মীর সাথে সম্পর্ক অবনতির কারণ হতো।

শুদ্ধাচার বইটি পড়ে অনুভব করলাম, আমাদের ছোট ছোট ভুলগুলোই একসময় অনেক বড় ফাটল সৃষ্টি করে। এখন আমি জীবনের এই ছোট ছোট ভুলগুলো শনাক্ত করতে পারছি এবং শুদ্ধাচারী হতে আরো সচেষ্ট হয়েছি। পারিবারিক জীবনেও আগের চেয়ে আমি সদাচারী হতে চেষ্টা করছি।

যখনই *শুদ্ধাচার* বইটি বিতরণের সুযোগ পাই, সহকর্মী ও আত্মীয়স্বজনকে আমি বলি, 'আপনি আমাকে ৩০০ টাকা দিন, বিনিময়ে আমি আপনাকে এমন একটি জিনিস দেবো, যা আপনি আগামী সাত দিন চর্চা করবেন এবং ভালো লাগলে অন্যদের সাথে আলোচনা করবেন। আর যদি মনে হয় এটি আপনার জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি, তবে টাকা ফেরত দিয়ে সেটি নিয়ে যাব।'

প্রভুকে ধন্যবাদ, গত ফেব্রুয়ারি থেকে বিতরণ করছি, এখন পর্যন্ত কেউই বইটি ফেরত দেন নি। অনেকেই বলেন, বইটি সবার ঘরে থাকা প্রয়োজন।

[উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, চক্ষু বিভাগ (প্রেষণে), জেনারেল হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা]

আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে শুদ্ধাচার বই

মোছাম্মৎ রহিমা খাতুন

একদিন কোয়ান্টামের অফিসে *শুদ্ধাচার* বইটি দেখলাম এবং সাথে সাথেই কিনে নিলাম।

আমার এক মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে আর ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। ভাবলাম, রাতে ঘুমানোর আগে সন্তানদের *শুদ্ধাচার* বই থেকে দু-এক পৃষ্ঠা পড়ে শোনাব।

এরপর সপ্তাহ পার হতে চলল, বইটি আর খুলে দেখার সময় পাই নি। কিন্তু প্রতি রাতে খেয়াল করতাম যে, আমার ছেলে ঘুমানোর আগে বইটি পড়ছে। মাঝে মাঝে আমাকেও পড়ে শোনায়। আমি মনে মনে খুব খুশি—যাকে পড়ে শোনাব বলে বইটি নিয়ে এসেছি, সে নিজেই আমাকে পড়ে শোনাচ্ছে। এখন বিছানায় মাথার পাশে বইটি রেখে সে ঘুমায়। প্রায় রাতেই তাকে আমি জিজ্ঞেস করি, 'বাবা, তুমি ঘুমাচ্ছ না কেন?' উত্তরে সে বলে—'*শুদ্ধাচার* বইটি না পড়লে ঘুম আসে না আম্মু।' *শুদ্ধাচার* পাঠ তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

একদিনের ঘটনা। বইটি পড়তে পড়তে ছেলে আমাকে বলল—'এ বইয়ে লেখা আছে, অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে স্মৃতিশক্তি কমে যায়।' তার কথা শুনে আমি স্রষ্টার প্রতি শুকরিয়া জানালাম। চারপাশে অনেক মা-বাবা শত বলেও সন্তানকে যা বোঝাতে পারছেন না, তা-ই আমার জন্যে সহজ করে দিল *শুদ্ধাচার* বই।

[শিক্ষক, কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নন্দন, সিলেট]

আরো সমমর্মী হয়ে উঠছি

এডভোকেট মো. জিল্লাদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর

অফিসে টেবিলের ওপর আমি সবসময় *শুদ্ধাচার* বইটি রাখি। মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ে যারা আমার কাছে আসেন, তাদের অনেকেই এই লাল রঙা বইটি দেখে কিছুক্ষণ পড়েন। পছন্দ হলে তারা সানন্দে কিনে নেন।

একজন সিনিয়র সহকারী জজকে *শুদ্ধাচার* বইটি উপহার দিয়েছিলাম। পরে তিনি আরো দুটি বই সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন, বইটি তিনি পড়েছেন এবং বইয়ের পরিবার অধ্যায়টি তার খুব ভালো লেগেছে।

প্রতিদিন মাগরিবের নামাজের পর স্ত্রী, মেয়ে ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে আমি পাঠচক্রে বসি। আমাদের মেয়ে *শুদ্ধাচার* বই থেকে একেকটি অধ্যায় আমাদেরকে পড়ে শোনায়। সে বর্তমানে প্রথম শ্রেণিতে পড়ছে।

শুদ্ধাচার চর্চার ফলে পরিবারে ভুল বোঝাবুঝির পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক কমেছে। একে অপরের প্রতি আমরা আরো বেশি শ্রদ্ধাশীল ও সমমর্মী হয়ে উঠছি। রাগ-অভিমানের কারণে আগের মতো বড় ধরনের পারিবারিক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে না। প্রত্যেকের জায়গা থেকে আমরা শুদ্ধাচার মেনে চলার চেষ্টা করি। ভুল হলে তা শুধরে নিই। আবার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেই—আমাদের কী করা উচিত। ফলে যে-কোনো সমস্যার সমাধান খুব দ্রুত ও সহজে হয়ে যায়।

[আইনজীবী, বগুড়া জজ কোর্ট, বগুড়া]

স্কুলপড়ুয়া সন্তানদের জন্যে বইটি কিনে নিলেন তারা

তামান্না মোস্তাক

আমার স্বামী একজন ব্যবসায়ী। কিছুদিন আগে মিরপুরে ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক আয়োজনে আমারও যাওয়ার সুযোগ হলো। এ অনুষ্ঠানে বড় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি এমন অনেকেই ছিলেন যারা খুব ছোট পরিসরে ব্যবসা করছেন।

করোনাকালে সারাদেশেই কর্মহীন হয়ে পড়েছিল শত শত মানুষ। তাই এখন ব্যবসাকে অনেকটা নতুন করেই শুরু করতে হচ্ছে। অনুষ্ঠানে সবার সাথে কথাপ্রসঙ্গে মেডিটেশন, মনছবি এবং শুদ্ধাচারের গুরুত্ব তুলে ধরলাম। সবাই এতটা আগ্রহ নিয়ে কথাগুলো শুনবেন তা আশা করি নি। সেদিন আমি ২০টি বই সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং ১১টি বই বিক্রি হয়ে গেল। কেউ কেউ এমনও ছিলেন যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই কিন্তু স্কুলপড়ুয়া সন্তানের জন্যে বইটি কিনে নিলেন। তাদের কথা হলো, 'আমি লেখাপড়ার সুযোগ পাই নি কিন্তু সন্তানকে শিক্ষিত ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।' তাদের আগ্রহ দেখে *শুদ্ধাচার* বই নিয়ে আমার কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে।

আরেকদিন সপরিবারে দাওয়াতে গিয়েছি পরিচিত একজনের বাসায়। তাদের সন্তানদের আচার-আচরণ দেখে আমি খুব মুগ্ধ হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলেমেয়েদের এত আদব-কায়দা শেখালেন কীভাবে?' গৃহকর্তা হেসে বললেন—'এতে আপনারও অবদান আছে!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'সেটা কীভাবে?' তিনি বললেন, 'কয়েক মাস আগে আপনি *শুদ্ধাচার* বই দিয়েছিলেন। সেটি আমরা সবাই চর্চা করছি। সন্তানদের আর বলে দিতে হয় না—কখন কোথায় কী আচরণ করতে হবে।'

[উদ্যোক্তা, জান্নাত ফ্যাশন হাউজ, মিরপুর, ঢাকা]

বইটির আকর্ষণ এত বেশি যে, কেউ 'না' করেন নি

সাগর চৌধুরী

শুদ্ধাচার বইটি হাতে পেয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। এরপর আমার ছয় জন সহকর্মীকে বইটি নেয়ার জন্যে বলেছি। প্রত্যেকেই বইটি পছন্দ করেছেন এবং কিনে নিয়েছেন। ছয়টি বই বিতরণের পর খুব সাহস পেলাম।

তারপর থেকে প্রতিদিন আমার ব্যাগে একটি বা দুটি *শুদ্ধাচার* বই রাখি। পরিচিতদের বলি, 'এটি এমন একটি বই, যা পরিবারের সবার জন্যে প্রয়োজন।' তারাও আগ্রহ করে *শুদ্ধাচার* বইটি নেন।

এ পর্যন্ত আমি ৪০টির বেশি বই বিতরণ করেছি। এর আকর্ষণ এত বেশি যে, বইটি নিতে কেউ 'না' করেন নি। আশা করি, বইটি চর্চা করে সমাজে শুদ্ধাচারী মানুষের সংখ্যা আরো বাড়বে।

[প্রধান শিক্ষক, চক্রশালা মাতঙ্গিনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমি একজন চিকিৎসক। এবছর আমার মা পরলোকগমন করেছেন। এরপর থেকে আমার রোগভয় ও মৃত্যুভয় অনেক বেড়ে গেছে। প্রায়ই অসুস্থ বোধ করছি। এ থেকে মুক্তির জন্যে দোয়া ও পরামর্শ চাই।*

উত্তর : ভয়-আতঙ্ক মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তাই ভয়ের কারণে অসুস্থতা বোধ করাটাই স্বাভাবিক। মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনারও বিনাশ করে এ ভয়। এজন্যে ভয়কে জয় করুন। অন্তরে বিশ্বাসের শক্তিকে জাগ্রত করুন। সবসময় প্রভুকে স্মরণ করুন। তাঁকে যত স্মরণ করবেন তত আপনার বিশ্বাসের শক্তি বাড়বে, তত আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নিজের কল্যাণে ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে পারবেন।

আসলে মৃত্যু হচ্ছে অবধারিত সত্য। মৃত্যুকে কারো পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়। এ থেকে বাঁচারও কোনো উপায় নেই। সময় হলে আপনাকে প্রভুর কাছে চলে যেতে হবে। তাহলে মৃত্যুকে ভয় পেয়ে কী লাভ? মরার আগে হাজার বার মরার কষ্ট কেন ভোগ করবেন?

আমরা আপনার মায়ের অনন্ত শান্তির জন্যে দোয়া করছি। আপনিও তার জন্যে দোয়া করুন, দান করুন এবং সৎকর্ম করে তার জন্যে উৎসর্গ করুন। আর মৃত্যু নিয়ে বেশি চিন্তা না করে আপনি বরং জীবনটাকে কাজে লাগানোর চিন্তা করুন। নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী হোন।

যেহেতু আপনি একজন চিকিৎসক, আপনার সৎকর্মের সুযোগ অনেক বেশি। আর আপনার জীবন যদি সৎকর্মে পরিপূর্ণ হয়, আপনি মৃত্যুকে হাসিমুখে স্বাগত জানাতে পারবেন। মৃত্যুর সময় আপনি বলতে পারবেন—*মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান*।

কারণ আপনি মানুষের সেবায় কাজ করে স্রষ্টার কাছে ফিরে যাবেন। অনেক সৎকর্মের আনন্দে আপনার আত্মা ফিরে যাবে সেই পরমাত্মার কাছে, যেখান থেকে সে এসেছে। অতএব যখনই মনে মৃত্যুভয় আসতে চাইবে, চিন্তা করবেন—ভালো কাজের পরিমাণ কীভাবে আরো বাড়ানো যায়।

আর ভয় থেকে মুক্ত থাকতে নিয়মিত দান করুন এবং চারপাশের মানুষকেও দানে উদ্বুদ্ধ করুন। আপনার উৎসাহে কেউ দান করলে সেই বরকত আপনিও পাবেন। নিয়মিত দান করলে কোনো ভয়-পেরেশানি থাকতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না'। *(সূরা বাকারা : ২৭৪)*

নিয়মিত মেডিটেশন করুন। বিশেষভাবে ভয়মুক্তির মেডিটেশনটি চর্চা করুন। সেইসাথে লামায় কোয়ান্টায়নে অংশ নিন। সুযোগ থাকলে শাখা সেলে মাসে একদিন কোয়ান্টায়ন করুন।

কারণ ভয়ের অস্তিত্ব মনের গভীরে, মনের অচেতন স্তরে। যত কোয়ান্টায়নে অর্থাৎ বিশুদ্ধ মৌনতায় ডুব দেবেন, তত আপনি ভেতর থেকে ভয়টাকে বের করে দিতে পারবেন। উপভোগ করবেন সুস্থতার আনন্দ।

প্রশ্ন : *গুরুজী, আমি কীভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করে আরো বেশি কাজ করতে পারব?*

উত্তর : আপনার কাজ করার আগ্রহকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আসলে প্রত্যেক মানুষের জন্যে এই কর্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পৃথিবী হচ্ছে কর্মক্ষেত্র। এজন্যে আমরা সবসময় বলি—যত ব্যস্ত তত সুস্থ, যত আরাম তত ব্যারাম।

সময়কে সফলভাবে কাজে লাগানোর সূত্র খুব সহজ। প্রথমত, জীবন থেকে আপনি কী চান, কী কী অর্জন করতে চান—সে ব্যাপারে লক্ষ্য স্থির করুন। কিছু হবে স্বল্প সময়ে অর্জনযোগ্য লক্ষ্য আর কিছু দূরপ্রসারী লক্ষ্য। এরপর পরিকল্পনা করুন দিনের শুরুতেই—কোন সময় কোন কাজটি করবেন।

সবসময় ডেডলাইন ঠিক করে কাজ করবেন যে, নির্দিষ্ট এই সময়ের মধ্যে কাজটি করব। এরপর ভাগ করতে হবে কোন অংশটুকু আগে করব এবং কোন অংশটুকু পরে করব। এভাবে কাজ করলে দেখবেন, নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ হচ্ছে। আবার কখনো হয়তো বেশি সময় লাগছে, কিন্তু কাজটি ঠিকই করা হচ্ছে।

আমরা অনেকেই কাজ করব বলে ভাবি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর করা হয় না। কারণ ভেতরে কোনো তাড়না থাকে না। লক্ষ্য সুস্পষ্ট থাকলে এবং সময় নির্ধারণ করলে তা কাজ সম্পন্ন করার পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। তখন সে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে। অতএব নিজেকে সবসময় কাজের পর কাজ দিয়ে রাখুন। সৎসঙ্ঘের সেবামূলক কাজেও সময় দিন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রত্যেকটি কাজ আনন্দ নিয়ে করা। অধিকাংশ মানুষ কাজ করে বিরক্তি নিয়ে। ফলে কাজের বরকত কমে যায় এবং মানসিক শক্তির অপচয় হয়। আপনি যখন আনন্দ নিয়ে কাজ করবেন তখন মনের অফুরন্ত শক্তি ব্যবহৃত হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ইতিবাচক শক্তির পরিমাণও বাড়বে।

অতএব খাবার খান আনন্দ নিয়ে। ব্যায়াম করুন আনন্দ নিয়ে। মেডিটেশন করুন আনন্দ নিয়ে। দিনের প্রতিটি কাজ করুন আনন্দ নিয়ে। কাজকে ইবাদত মনে করুন। দেখবেন, অনেক কাজ করার পরও কোনো ক্লান্তি আসছে না।

প্রশ্ন : *আমি পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য অনেক কিছু ভুলে যাই। কিছুই মনে থাকে না। কী করব?*

উত্তর : 'মনে থাকে না' কথাটিই আর বলবেন না। এটি একটি নেতিবাচক অটোসাজেশন। আর আপনার কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে যে, বিষয়টি কেন মনে রাখতে চাচ্ছেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করুন ও নিয়মিত ব্যায়াম করুন। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ও মনোযোগ বাড়াতে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এখন এ পরামর্শগুলোই দিচ্ছেন।

মনে রাখা আসলে চর্চারও বিষয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন কোয়ান্টাম মেথড বইয়ের অধ্যায়-১৩। আগ্রহ, মনোযোগ ও চর্চার মাধ্যমে যে-কেউ মনে রাখার শক্তি অর্জন করতে পারেন। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। আপনিও পারবেন।

প্রশ্ন : *আমার শ্বশুরবাড়ির কেউ কোয়ান্টাম পছন্দ করে না। আমি কোনো প্রোগ্রামে আসতে চাইলে শাশুড়ি বাধা দেন, রাগ করেন। অথচ নিয়মিত কোয়ান্টামে এলে আমি শারীরিক মানসিকভাবে অনেক ভালো থাকি। আমি কী করতে পারি?*

উত্তর : প্রথমত, শাশুড়ির সাথে কোনোরকম বিতর্ক কিংবা দ্বন্দ্বে জড়াবেন না। দ্বন্দ্বে জড়ায় বোকারা। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমরা বলি—যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না, সেই সম্পর্কের মাঝে কখনো দেয়াল তুলবেন না। দ্বিতীয়ত, বাধা দেয়াটাকে স্থায়ী বাস্তবতা মনে করবেন না।

আপনি সবর করুন এবং আপনার প্রো-একটিভ আচরণ দিয়ে শাশুড়িকে জয় করতে চেষ্টা করুন। আন্তরিকভাবে তার যত্ন নিন। মমতা দিয়ে তার সেবা করুন। মমতার ভাষা সবাই বোঝে। ধীরে ধীরে শাশুড়ির মনে আপনার জন্যে স্থান তৈরি হবে। তখন আপনি কিছু বোঝালে তিনি ঠিকই বুঝতে চাইবেন। কারণ মানুষ যাকে পছন্দ করে তার অনেক কিছুই সহজে মেনে নেয়। কিন্তু যদি পছন্দ না হয়, ভালো কথাও বুঝতে চায় না।

তাছাড়া সব কথা সবসময় বলাও যায় না। একজন হয়তো খুব রেগে আছে। এমন সময় যদি তাকে বলেন 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'—তার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যাবে। কারণ তখন তো কথাটা বোঝার মতো অবস্থা তার নেই।

শাশুড়ি যে বাধা দিচ্ছেন, এজন্যে আপনার মনে যেন বিরক্তি না আসে। কারণ তার আচরণে প্রভাবিত হয়ে আপনার মনে যদি রাগ-ক্ষোভ জমে, তাহলে তাকে কখনোই প্রভাবিত করতে পারবেন না। বিরক্ত হলে বরং আপনার শান্তি নষ্ট হবে। মনের আবর্জনা থেকে অসুস্থতার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

অতএব আপনি যে শাশুড়িকে শ্রদ্ধা করেন, এটা তাকে বুঝতে দিন। শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। অস্থির হবেন না। কারণ এটা সারা জীবনের ব্যাপার। কোয়ান্টামে এসে যে আপনি উপকৃত হচ্ছেন, আপনার আচরণে তা প্রকাশ পেতে দিন। আপনার ভালো থাকার মাত্রা বাড়ছে—এটা তার মনের অবস্থা বুঝে সময়-সুযোগমতো বলুন। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারেও বোঝাতে থাকুন।

দেখবেন, একসময় শাশুড়ি নিজেও কোয়ান্টামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন। অতএব সময় নিন। ধৈর্যের সাথে আপনার করণীয় করে যান। আজ কাল বা পরশু, আপনার ইতিবাচক প্রচেষ্টার জয় হবেই।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি দীর্ঘায়ু হবো।
সুস্থ থাকব, সুখী হবো।
উজ্জ্বল জীবন আমারই জন্যে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোয়ান্টাম ইয়োগা

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৭ ও ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমে পৃথক দুটি ব্যাচে অংশ নেন ৬৩ জন পুরুষ ও ৩০ জন নারী বিসিএস কর্মকর্তা।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার কমপ্লেক্সে মেডিটেশন সেমিনার

৬ নভেম্বর ঢাকার বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয় মেডিটেশন সেমিনার। এ আয়োজনে 'মানসিক উৎকর্ষ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ধ্যান' শীর্ষক আলোচনা ও মনছবি মেডিটেশনে অংশগ্রহণ করেন ৬০ জন বিভিন্ন বয়সী শিশু-নারী-পুরুষ।

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ সংযোজন ছিল বঙ্গাসন ও দমচর্চার সেশন। বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের অধীনে বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন-ইয়ুথের সার্বিক সহযোগিতায় চারু একাডেমি অব আর্ট এন্ড কালচার-এর আমন্ত্রণে দেড় ঘণ্টাব্যাপী এ সেমিনারটি পরিচালনা করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

কোয়ান্টামম লামায় শিশু-কিশোর প্রোগ্রাম

চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে ২৩-২৭ অক্টোবর কোয়ান্টামম লামায় অনুষ্ঠিত হয় পাঁচ দিনব্যাপী শিশু-কিশোর প্রোগ্রাম। এতে ছিল কোয়ান্টামম লাইব্রেরি ও স্থাপনা পরিদর্শন, মুরং পল্লী ভ্রমণ, শুদ্ধাচার পাঠচক্র, গুণীজন সেশন, সিরাত পাঠের আসর, গণিতের ধাঁধা। আরো ছিল জীবনের লক্ষ্য ও পরিবারের সাথে একাত্মতার মেডিটেশন। স্বাস্থ্য-সুরক্ষার নিয়ম মেনে এতে অংশ নেয় ৪০ জন।

তুরাগ প্রি-সেলে বিশেষ ওয়ার্কশপ

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন উত্তরার তুরাগ প্রি-সেলে শিশু-কিশোর-অভিভাবকদের নিয়ে ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ ওয়ার্কশপ। এতে ছিল সফল শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক আলোচনা, ডকুমেন্টারি, কোয়ান্টাম ইয়োগা এবং মনছবি মেডিটেশন। স্বাস্থ্য-সুরক্ষার নিয়ম মেনে ৬৬ জন অংশ নেন এ ওয়ার্কশপে।

মেডিটেশন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনার

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) : কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে ২-৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে মেডিটেশন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনার। দুই ঘণ্টাব্যাপী এ কার্যক্রমে প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন শিক্ষক অংশ নেন। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'করোনা ও বাস্তবতা', 'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট' ও 'শুদ্ধাচার'।

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) : ৯ ও ১৬ নভেম্বর ৮০ জন পুরুষ কর্মকর্তাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এ সেমিনারটি। মেডিটেশনের পাশাপাশি এতে 'সুখী জীবনের সূত্র ও শুদ্ধাচার' বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন ঢাকা : ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় দুঘণ্টাব্যাপী মেডিটেশন সেমিনার। এতে অংশ নেন ১২ জন সাব-ইন্সপেক্টর।

কাকরাইলে কোয়ান্টাম দাফনসেবার হাম্মাম উদ্বোধন

কাকরাইলস্থ হাম্মাম

ধর্মবর্ণ ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সম্মানজনক শেষ বিদায়ের লক্ষ্যে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম দাফনসেবা কার্যক্রম। মৃত ব্যক্তিকে আপনজনের মমতা ও যত্নে ওজু-গোসল-পরিচ্ছন্নতা ও কাফনের কাপড় পরাতে স্থাপন করা হয়েছে হাম্মাম।

৩০ অক্টোবর শুক্রবার ছয় সদস্যের কোয়ান্টাম দাফনসেবা টিম কর্তৃক একজন মৃতের ওজু-গোসলের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে কাকরাইলের নবনির্মিত হাম্মাম। দাফনসেবার ফ্রিজিং ভ্যানে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আজিমপুর কবরস্থানে।

এবছর সেপ্টেম্বরে বনশ্রীতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রথম হাম্মাম উদ্বোধন করা হয়। উল্লেখ্য, যে-কেউ এ সেবা গ্রহণ করতে পারেন বিনামূল্যে।

সভ্যতা যাদের কাছে ঋণী

নিজের কাজ, দর্শন ও অবদান দিয়ে পৃথিবী ও সভ্যতাকে ঋণী করে গেছেন যারা—তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গুরুজী আলোকপাত করছেন ফাউন্ডেশনের নিয়মিত কার্যক্রমগুলোতে। সেই আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হচ্ছে কোয়ান্টাম বুলেটিনের ধারাবাহিক এ আয়োজনে। উনিশ শতকের চিন্তাবিদ ও লেখক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ডিসেম্বর ২০২০-এ ১৪০ তম জন্মদিন ও ৮৮ তম মৃত্যু দিবসে তার প্রতি জানাই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

মহান শিক্ষাব্রতী ও নারী জাগরণের অগ্রপথিক
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

১১৫ বছর আগের কথা। সমাজে নারীর কোনো অবস্থান ছিল না। বাড়ির চৌহদ্দি পেরোতে পারত না তারা। তাদের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলো তখনো জ্বলে ওঠে নি। *সুলতানার স্বপ্ন* উপন্যাসে এক তরুণ লেখিকা তুলে ধরলেন সমাজের বিপরীত চিত্র—নারীরাও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমাজে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মম সত্য প্রকাশ করলেন *মতিচুর*, *অবরোধ-বাসিনী*, *পদ্মরাগ* ইত্যাদি সৃজনশীল লেখায়। তার শত বছর আগের সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবতা। নারীদের মাঝে শিক্ষা ও জাগরণের স্বপ্ন বুনতে যিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন, তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দে অভিজাত জমিদার পরিবারে তার জন্ম। তার বাবা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাদানে তার অনীহা ছিল। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার আদলে মেয়েরা যেন কোরআন-হাদীস পড়তে পারে এবং ধর্মাচার পালন করতে পারে, সেজন্যে তাদের আরবি ও ফারসি শিখিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বেগম রোকেয়া ও তার বোন হুমায়রা ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। বড় ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের রাতে মোমবাতির আলোতে তাদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষা পড়তে ও লিখতে শেখান।

কিশোরী বয়সে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উর্দুভাষী অবাঙালি খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন রোকেয়ার চেয়ে ২০ বছরের বড় ও বিপত্নীক। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল সুখের, পারস্পরিক শ্রদ্ধার। পড়াশোনার প্রতি স্ত্রীর তীব্র আগ্রহ দেখে তার লেখালেখির প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাখাওয়াত হোসেনের ছিল নিরন্তর উৎসাহ। পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশের পাশাপাশি সাহিত্য অঙ্গনে পদচারণার মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া পেয়েছিলেন মুক্তির স্বাদ। স্বামীর সান্নিধ্যে তিনি ইংরেজিতেও দক্ষ হয়ে ওঠেন।

জ্ঞান অর্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে ফরজ

ইসলাম নারীর যে অধিকার দিয়েছে তা সম্পর্কে বেগম রোকেয়া অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই এবং এটি উভয়ের জন্যেই ফরজ—এই সত্যটি তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন।

এ উপলব্ধি থেকেই ১৯০৯ সালে তিনি ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন স্বামীর মৃত্যুর পর। যার শুরুটা হয়েছিল একটি বেঞ্চ, পাঁচ জন ছাত্রী এবং শিক্ষিকা স্বয়ং বেগম রোকেয়াকে নিয়ে। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করতে নেমে পড়েন। সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় একসময় ভাগলপুর ত্যাগ করতে হলো তাকে। পাড়ি জমালেন কলকাতায়। লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন, জানতেন—জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নেই। শিক্ষার আলোয় আলোকিত না হলে নারীরা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে না।

মনোবলই ছিল একমাত্র পুঁজি

তার বয়স তখন ৩০। কলকাতায় নতুন পরিবেশ, আত্মীয়স্বজন নেই। প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি বা বাড়ির বাইরে কাজের অভিজ্ঞতাও ছিল না। একমাত্র পুঁজি ছিল মনোবল ও সাহস। তা দিয়েই নতুন করে আরম্ভ করলেন স্কুলের কার্যক্রম। এবারে দুটি বেঞ্চ, আট জন ছাত্রী। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারগুলো তখন মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিরোধী ছিল।

ফলে সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে বেগম রোকেয়ার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাদের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল, বাড়ির বাইরে পড়তে গিয়ে যদি মেয়েদের পর্দা নষ্ট হয়ে যায়! বেগম রোকেয়া নিশ্চিত করেছিলেন যে, তার স্কুলে কঠোরভাবে পর্দা মানা হবে এবং তা-ই হতো। তিনি নিজেও বোরকা পরে বাইরে বের হতেন।

১৯০৯ সালে তার স্বামী মারা যান। স্কুলের জন্যে তার দেয়া ১০ হাজার টাকাসহ রোকেয়ার মোট সঞ্চয় ছিল ৩০ হাজার টাকা। এ অর্থ জমা ছিল তৎকালীন বার্মার একটি ব্যাংকে। মেয়েদের স্কুল চালু হওয়ার দুই-এক বছরে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যায়। পুঁজিশূন্য এবং সহযোগিতাহীন এমন পরিস্থিতিতেও তিনি দমে যান নি। হারান নি তার দৃঢ় মনোবল।

গড়ে তুললেন মুসলিম নারী সঙ্ঘ

একপর্যায়ে তিনি উপলব্ধি করলেন, একা বড় কাজ করা যায় না। সঙ্ঘ গড়তে হবে। নারীদের সংগঠিত না করলে এই শিক্ষালয় টিকিয়ে রাখা যাবে না। সে চিন্তা থেকেই ১৯১৬ সালে গড়ে তুললেন ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’ নামে মুসলিম নারী সঙ্ঘ। শিক্ষাবঞ্চিত নারীদের আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল এর লক্ষ্য। এ-ছাড়া নারী জীবনের বাস্তবতার সাথে মিল রেখেই প্রাতিষ্ঠানিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি হস্তশিল্প এমনকি নারীদের শরীরচর্চার ব্যবস্থা করেন তিনি, যা তার দূরদর্শী চিন্তারই প্রতিফলন।

একজন নারীকে আল্লাহর রসুল (স) যে-সব অধিকার দিয়ে গেছেন, তা আদায়ে বাস্তব জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই—সেটা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। তাই ধীরে ধীরে সমাজসেবায় মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে, যেন নিন্দা গ্লানি উপেক্ষা অপমান কিছুতেই তাহাকে আঘাত করিতে না পারে। মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে, যেন ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ সকলেই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।’

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
(৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ – ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২)

লালন করতেন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিনিয়ত বাধা অতিক্রম করেই সামনে এগিয়েছেন সমাজ-সংস্কারক বেগম রোকেয়া। সকল সংকটে সবসময় তিনি সমাধানের কথা চিন্তা করতেন। দৃঢ় মনোবল, আত্মবিশ্বাস, সাহসের সাথে নিন্দা গ্লানি অপমান সহ্য করার ক্ষমতাই এ ক্ষণজন্মা নারীর সবচেয়ে বড় গুণ। তিনি সবর করতে জানতেন। প্রতিকূলতাকে নীরব কাজ দিয়েই জয় করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—প্রতিভার মৃত্যু নেই এবং কাজের কখনো বিনাশ হয় না।

যে কয়জন ছাত্রী তার স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, তারা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে সমাজের টীকাটিপ্পনি লোকনিন্দা জয় করে বাংলার নারী জাগরণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। কলকাতা সরকারি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, এর অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন বেগম রোকেয়ার ছাত্রী।

কর্মময় মৃত্যু

১৯৩২ সাল। বেগম রোকেয়ার বয়স তখন ৫২ বছর। রুটিনমাফিক কর্মব্যস্ত দিনের শেষে রাতে যথারীতি টেবিলে বসে লিখছিলেন। ৯ ডিসেম্বর ভোরবেলা কলম হাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

তার সেই অসমাপ্ত লেখা ‘নারীর অধিকার’। পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় সংকল্পে কাজ করতে করতে স্রষ্টার ডাকে সাড়া দেয়া—এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত! শিক্ষিত জাতি নির্মাণে প্রাণান্ত প্রয়াসের কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এ মহীয়সী নারী।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : ডিসেম্বর ২০২০ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd